ষ ষ্ঠ অ ধ্যা য় উপসংহার

এই গবেষণাকর্মের মূল উদ্দেশ্য হল, উনিশ শতকের কলকাতায় শিষ্ট নাগরিক সাহিত্য বনাম অপর সাহিত্যের দ্বান্দ্বিকতার সূত্র সন্ধান। নানাবিধ প্রশ্ন এবং প্রতিপ্রশ্নের নিরিখে বিচার করে সেই দুই প্রতিপক্ষের দ্বৈরথের সম্যক রেখাচিত্র তুলে ধরা। যেহেতু এই দন্দের নির্ধারিত কালপর্ব উনিশ শতক, স্থান কলকাতা নগর---সেই কারণেই প্রাসঙ্গিক ভাবে আনতে হয়েছে অখ্যাত তিনটি গ্রামের সমাধির ওপর গড়ে ওঠা নতুন নগর কলকাতার বিকাশের কথা, বিদেশি বণিকের এবং পরবর্তী প্রশাসকের হাত ধরে তার অভূতপূর্ব রূপান্তরের কথা, তার হাত ধরে আধুনিকতার নতুন মাত্রা রচনার কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ) এই বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন :

'একদিন কলিকাতা ছিল অখ্যাত অসংস্কৃত পল্লী; সেখানে বসল বিদেশী বাণিজ্যের হাট, গ্রামের শ্যামল আবেষ্টন সরিয়ে দিয়ে শহরের উদ্ধৃত রূপ প্রকাশ পেতে লাগল। সেই শহর আধুনিক কালকে দিল আসন পেতে; বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রের পথে দিগন্তের পর দিগন্তে সেই আসন বিস্তৃত হয়ে চলল।'

সমগ্র এশিয়া থেকে ইংরেজরা যে পরিমাণ পণ্য আমদানি করত, তার প্রায় ৬০ শতাংশই ছিল বাংলার পণ্য। কাজেই বোম্বাই, সুরাট ও মালাবার তথা পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যের চাইতে কোম্পানির বাংলাদেশে বাণিজ্যিক স্বার্থ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর এই বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্য এখানে উপযুক্ত বাণিজ্যাকেন্দ্র স্থাপন করা খুবই প্রয়োজন ছিল। বিভিন্ন স্থান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ঘটনাচক্রে কলকাতাই হয়ে উঠল প্রাচ্যে বাণিজ্যের সেই অন্যতম প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। গ্রামের পাঁজর ফাটিয়ে জেগে উঠতে লাগল ভবিষ্যতের মহানগর। জীবন-জীবিকার তাগিদে আর ভাগ্যাম্বেষণে গ্রাম থেকে শহরবাসী হল অজস্র মানুষ। এই দিগন্তবিস্তারী মহা-নাগরিকতার পটে উনিশ শতকে রচিত হল তথাকথিত 'ভদ্রলোক' এবং 'অপর' এর নতুন সংজ্ঞা। এতকালের সামাজিক কাঠামোয় এলো নানা রূপান্তরের ছোঁয়া। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো এক ভিন্নস্বাদী নাগরিক স্বাধীনতা নিয়ে এলো নতুন নগর। অর্থ, বিত্তের পাশাপাশি নব্য শিক্ষার মানদণ্ডে নতুন করে নির্ণীত হতে লাগল শিষ্ট এবং অশিষ্ট নাগরিকের চরিত্র-লক্ষণ। আধুনিক শিক্ষানীতির সোনার কাঠির স্পর্শে স্ক্ষ্মভাবে বৈষম্যের জাল ছড়িয়ে দেওয়া হল। নতুন সভ্যতার স্পর্শে আলোকিত হল যারা, বদলাতে থাকল তাদের রুচি। এই রুচির পার্থক্য ক্রমশ বৃদ্ধি করতে লাগল উভয়

শ্রেণির ব্যবধান। গ্রাম থেকে নতুন নগরে চলে আসা প্রথম প্রজন্মের শহরবাসীদের মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক থেকে জল-অচল ব্যবধান ছিল না। কিন্তু ক্রমশ পরিস্থিতির বদল ঘটতে লাগল।

নতুন শিক্ষা, নতুন রুচি, নব্য জীবন-চেতনা উনিশের মানুষের মননে এনেছিল এক সুদূরপ্রসারী বিবর্তন। পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির স্পর্শে উনিশ শতকে ঘটেছিল বাংলায় নবজাগরণ। যে জাগরণের ফলে পাশ্চাত্য থেকে আগত নতুন চেতনার স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এদেশে সঞ্চিত বহুবিধ জীর্ণতা আর বদ্ধতাকে। সবচেয়ে বড় কথা, তা এক নতুন শ্রেণির বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। তাঁরা হলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। মুক্ত চিন্তার সূত্র ধরে নতুন আলোর পথযাত্রীরা একই পথের পথিক হয়ে উঠছিলেন। সমালোচক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন:

'what connected them all was that they shared in the creation and formation, in one way or another, of a mentality which straddled two cultures, Western and Indian. This cross-cultural mentality, let us call it the Indo-Western mind, was the ultimate and supreme product of the Bengal Renaissance.'²

কী করে মানুষের জীবনের মাটিতে সুদূর ভিন্নমাত্রিক সভ্যতার বীজ এসে পড়ে, কেমনভাবে তাদের চেতনায় অঙ্কুরিত হয় সেই সভ্যতার মহীরুহ, এই যুগ তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। উপনিবেশিক পর্বে যখন পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে এক অভাবনীয় নতুন আলো বাঙালির জীবনে বিচ্ছুরিত হল তখন তা সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং চিন্তাজগতকে সম্যকভাবে প্রভাবিত করেছিল। তারই সাপেক্ষে কেমনভাবে নব্য বাঙালি মননশীল বুদ্ধিজীবীরা পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির টানে সাড়া দিচ্ছিলেন, নতুনকে বপন এবং চয়ন করার নিজস্ব শর্তগুলো কেমনভাবে বাঙালির বুদ্ধি-চর্চা ও জীবন-চর্চায়, বহিরঙ্গে-অন্তরঙ্গে কোথাও সমবায়, কোথাও সিদ্ধি বা সংঘর্ষের আকার নিচ্ছিল, এই ভাবধারা কেমনভাবে কখনো উচ্চকিত, কখনো অন্তঃশীল হয়ে বইছিল সেকালের বাঙালির মননে, এই যুগ তার সাক্ষ্য-বাহী।

তবে বাংলার নবজাগরণের যে উজ্জ্বল মুহূর্তের বিবরণ পাওয়া যায়, তার মধ্যেও যে কিছু কিছু ব্যাধির জীবাণু ছিল, ছিল কিছু নেতিবাচকতা, সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার (১৯০০-১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ) এ বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন :

'Yet the Bengal Renaissance has certainly its own specific relative value. Historians are now acutely conscious of the serious limitations of the renaissance in Europe itself; the old halo has largely faded. Our 'pre-renaissance' society, again was undoubtly depressing; a recovery from the stupor has its own merit.

The guide-line for a proper assessment of what happened in the cultural life of 19th century Bengal must then steer between uncritical adulation and scornful rejection. A historical appreciation of the 'new life' in Bengal is possible, even after recognising its obvious weakness: it did move on the axis of the upper stratum alone of society, the 'bhadroloks'; it could not draw in the Muslim community and the masses of the backward Hindus; it failed to strike a consistent anti-imperialist note, in sharp contrast to the role of the intellectuals in the Russia of the same period."

মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজে নবজাগরণ পর্বে সৃষ্টির একটা জোয়ার এসেছিল। চিন্তা-চেতনার জগতেও কমবেশি একটা পরিবর্তন এসেছিল। সেই সৃজনশীলতা এবং মনোজগতের পরিবর্তন আপামর জনতাকে কতটা স্পর্শ করতে পেরেছিল তা নিয়ে অবশ্য কিছু প্রশ্নের অবকাশ আছে। এমনকি সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের মধ্যেও তা বিশেষ আলোড়ন তুলতে পারেনি। তবে এইসব ক্রটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও বাঙালির জীবনে এই সময়-পর্বের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অস্থির, সেকালের বাঙালি যেন এই পর্বে জীবনকে পুনর্গঠন করতে প্রয়াসী। এ পর্ব নব্য বাঙালির আত্ম-অনুসন্ধানের, আত্ম-আবিষ্কারের পর্ব। বাঙালি তার মধ্যযুগীয় মনের কাঠামো থেকে এইসময় ক্রমেশ বেরিয়ে আসতে থাকে। গতানুগতিক নির্বিকারত্ব অতিক্রম করে নানা বিষয়ে প্রশ্ন-মুখর হয়ে উঠতে থাকে। ফলে একথা অস্বীকার করলে চলবে না যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বৃদ্ধিজীবী শ্রেণির উদ্ভব আর বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃজিত হয়েছিল সে পর্বেই।

তারাই হয়ে উঠছিল আগামী দিনের সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারাপথের নির্ণায়ক শক্তি। তাদের ছিল নতুন শিক্ষার তেজ, নতুন সামাজিক মর্যাদা লাভের গৌরব। সেকালের শিক্ষিত যুবকেরা ইংরেজি শিক্ষা এবং সাহিত্যের হাত ধরে পাচ্ছিল এক ভিন্নমাত্রিক জগতের স্বাদ। ইংরেজি সাহিত্য যোগাচ্ছিল মনের খোরাক, আর ভাষা ছিল তার চাবিকাঠি। নতুন জগতের খবর পাওয়ার বাসনায় ইংরেজি ভাষা আর সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনই এটাও মনে হয়েছিল যে এই ভাষায় দক্ষতা এনে দেবে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, পদমর্যাদা বৃদ্ধির সুযোগ, আর্থিক সমৃদ্ধি। সমালোচক বলছেন:

'সাগরপারের নাম না জানা বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক এদেশের তরুণদের সামনে নিয়ে এলেন এক অজানা জগতের খবর।...অনেক শিক্ষিত বাঙালি যুবক ইংরেজিকেই প্রাণের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে, তাতে শুধু লিখতে, বলতে, পড়তেই আরম্ভ করলেন না, তাঁরা স্বপ্নও দেখতে আরম্ভ করলেন ইংরেজিতে! এর পেছনে অন্যান্য কারণের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষিতের উজ্জ্বল সামাজিক ও আর্থিক ভবিষ্যতের প্রলোভনও কাজ করেছিল।'

এদিকে ইংরেজ বণিকের নির্মোক ছেড়ে উপনিবেশের প্রভু হয়ে ওঠার পর বিদেশি শাসকদের প্রয়োজন হয়েছিল নিজেদের শিক্ষা এবং রুচির অনুরূপ এক সম্প্রদায় গঠন। যারা তাদের প্রতি অনুগত থেকে এই উপনিবেশের সাম্রাজ্যরক্ষায় সুরক্ষা বলয়ের কাজ করবে। পরিণামে পাবে উপশাসকের পুরস্কার। প্রয়োজনীয় ইংরেজি শিক্ষা এই শ্রেণির উত্থানে সহায়ক হবে। এভাবেই তৈরি হচ্ছিল ভারতীয় ইংরেজি- শিক্ষিত এক সম্প্রদায়। নীরদচন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৭-১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ) পরবর্তীকালে তাঁর 'কন্টিনেন্ট অব সার্সি'তে (১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ) 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি' বলে যে শ্রেণির কথা উল্লেখ করেছেন, তারা এদের উত্তরপুরুষ বললে ভুল হয় না। তারা দেশের বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় মুষ্টিমেয়, কিন্তু দেশের শাসনক্ষমতাকে, বিভিন্ন নীতিকে প্রভাবিত করার অধিকার তাদের সবচেয়ে বেশি।

যতদিন এ দেশের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কটা বাণিজ্যের মাধ্যমেই সম্পর্কিত ছিল ততদিন এ-দেশবাসীর কোনও বিষয়েই তাদের মাথা ঘামাবার বিশেষ প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু যখনই এই সম্পর্কের মাত্রা বদলে যায়, জেতা-বিজেতা, রাজা-প্রজার ধারণা অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখনই আধিপত্য আর আনুগত্যের সমীকরণ নতুন করে সাজিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এদেশের বিপুল কাঁচামাল এবং বৃহৎ বাজার ঔপনিবেশিক প্রভুশক্তিকে উল্লসিত করে তোলে। এদেশে উপনিবেশের মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য, সুবিশাল বাজারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, নিরাপদে শাসন চালাবার জন্য করতে হয় বিভিন্ন আয়োজন। মূল থেকে বিনষ্ট করে দিতে হয় যে কোনও অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনাকে।

বিচ্ছিন্ন করে দিতে হয় দেশের শিকড়ের সঙ্গে দেশের বুদ্ধিজীবীদের আত্মিক সংযোগকে। প্রতিনিয়ত মেধাজীবীর মন্তিষ্কের দখল নেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করতে হয়। পৃথিবীর সমস্ত উপনিবেশের ক্ষেত্রেই যেহেতু এমনটা ঘটে, তাই এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়ন। তথাকথিত শিষ্ট ভদ্রলোক এবং তার অভিজ্ঞতার বাইরে থেকে যাওয়া অগণন জনতা, যারা 'অপর' হিসেবে চিহ্নিত হবে, উভয় শ্রেণির মধ্যে রচে দেওয়া হয় সাত সমুদ্রের ব্যবধান। আর সবকিছুর মতই সাহিত্য-সংস্কৃতিও এখানে হয়ে ওঠে তার একটি মাধ্যম। এই কারণেই সাহিত্য-সংস্কৃতির মানচিত্রে নতুন করে বিভাজনের কলঙ্ক-রেখা পড়ে। নতুন শিক্ষা এবং সভ্যতার স্পর্শে নতুন করে জেগে উঠতে থাকে সমাজের মান্য বা শিষ্টবর্গের আস্বাদিত নতুন নতুন নাতুন শাখা। বিভিন্ন তার রূপভেদ, তার আঙ্গিক, তার শৈলী, তার বিস্তার। তা আলোকপ্রাপ্ত শিষ্ট সম্প্রদায়ের মনন-চর্চার ফসল। এই সাহিত্য পাশ্চাত্যের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত। এর ফলে আমাদের গতানুগতিক ভাবে বহুমান সাহিত্যধারায় একটা বিপুল পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, সাহিত্য-ক্ষেত্র উর্বর হয়ে উঠেছিল, তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশের আপামর জনতার সঙ্গে তার সংযোগ তুলনায় ক্ষীণ। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য (১৯৪৯ খ্রিস্টান্দ) জানাচ্ছেন:

'উনিশ শতকে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপোষ করে এদেশে ওপনিবেশিক শাসকের চাতুর্যে এবং মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার সহযোগিতায় আধুনিকতার যে বিশেষ আদলটি গড়ে উঠেছিল, স্থিতাবস্থার পোষকতা করাই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়ার দর্শনকে ভিত্তি করে সাহিত্য ও সংস্কৃতির নন্দনকে তা জন্মসূত্রে পঙ্গু করে দিয়েছে। যত দিন গেছে, প্রতীচ্যের সংস্পর্শে স্তরে-স্তরে পলিমাটি অনেক জমে উঠেছে; ফসলও গোলায় উঠেছে অনেক। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতার সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে নামমাত্র। বরং নিজস্ব শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আর ঐ বিচ্ছিন্নতার মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টায় মুখোশের ওপরে চেপে বসেছে আরও অনেক রঙিন মুখোশ।'

আর জনরুচি যাতে তৃপ্ত, সেই সাহিত্য, সেই সংস্কৃতি প্রাপ্ত হয়েছে অপরত্বের অভিধা। সাংস্কৃতিক রাজনীতির চরম কৌশলে মান্য সাহিত্য হিসেবে যা স্বীকৃত হয়েছে তা পাশ্চাত্য রুচির মাপকাঠিতে মার্জিত এবং পরিশীলিত।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রাচীনকাল থেকেই অভিজাত সমাজ এবং জীবনকে কেন্দ্র করে সাহিত্যচর্চার ধারা বহমান ছিল। তা ছিল শাসকের রুচির এবং বিলাসের উপযোগী। অর্থাৎ মূলত শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট। কিন্তু নতুন যুগে তা আর নিজের গৌরব বজায় রাখতে পারেনি। দেখা যাচ্ছে, এতকাল আমাদের উচ্চবর্গ যার রসাস্বাদন করত, তাও কোণঠাসা হয়ে পড়েছে পাশ্চাত্যপন্থীর রুচির পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হবার কারণে। নিয়মনিষ্ঠ, প্রাতিষ্ঠানিক, আধিপত্য-বাদী একটা জ্ঞানচর্চার পরিসর গঠনের সচেতন প্রয়াস লক্ষিত হয়েছে। আর চিরকাল জনসভার প্রাঙ্গণে লোক-রুচির পোষকতা করে এসেছিল যেসব আখ্যান-উপাখ্যানের ধারা, যে সব সাংস্কৃতিক বিনোদনের মাধ্যম---তারা ব্রাত্য হয়ে পড়েছে প্রভুশক্তি এবং তার অনুগত গোষ্ঠীর অনুমোদন লাভে বঞ্চিত হওয়ায়। এভাবেই আপামর জনগণের মনোরঞ্জক জন-সাহিত্য পরিভাষার রাজনীতির চক্রান্তে পরিণত হয়েছে অপর সাহিত্যে। এই 'অপর' এর শিকড় সন্ধান করলে তাই বিস্ময় জাগে, কারণ এই 'অপর' আসলে আদি অকৃত্রিম দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারা। অপর সাহিত্যের পরম্পরা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখানো হয়েছে দীর্ঘকাল এই ধারা সাবলীলভাবে বহমান ছিল। তারপর নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষের হাত ধরে এই ধারা উপস্থিত হল শহরে। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক চাপে স্থানান্তরিত এই সাহিত্য-সংস্কৃতির আঙ্গিক ও অন্তর্বস্তুর বদল ঘটতে লাগল। ক্রমে ঔপনিবেশিক প্রভুশক্তির হাত ধরে আমদানি করা শিক্ষা-সংস্কৃতির অভিমানে আত্মগর্বী বিদগ্ধ সমাজের উপেক্ষায় এই ধারা হারাল তার অতীতের কৌলীন্য। ঔপনিবেশিক মূল্যবোধের দ্বারা নির্ধারিত শিক্ষিতের মনন-চর্চায় তার আর কোনও স্থান রইল না। তাকে দেওয়া হল 'অপর'-এর অভিধা। এই অপর সাহিত্য সাধারণত 'বটতলার সাহিত্য' হিসেবে পরিচিত। বিশেষত বটতলার সাহিত্য সংখ্যাগরিষ্ঠের সাহিত্য হলেও, জনপ্রিয় হলেও তাকে অস্বীকরণের একটা প্রবণতা দেখা যায়। স্বল্প মূল্যে, সস্তা কাগজে ছাপা বইয়ের বিপুল সম্ভারের কারণে বটতলা জনতার কাছে খুব সহজে পৌঁছতে পেরেছিল। জনতার পাঠের আকাঙ্কার সঙ্গে, তাদের চাহিদার সঙ্গে যোগানের ভারসাম্যও বজায় রাখতে পেরেছিল বটতলা। সেখান থেকে প্রকাশিত বইয়ের তালিকায় চোখ বোলালে জন-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা হওয়া সম্ভব। কিন্তু তা সুস্থ রুচির নয়, চিত্ত-দূষণের অন্যতম মাধ্যম, এইসব কারণ দেখিয়ে তাকে বারবার আটকানোর চেষ্টা হয়েছে। আইন এবং প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে তাকে নির্মূল করতে চাওয়া হয়েছে। আর তারই পাশাপাশি এতকালের কবিগান, ঝুমুর, পাঁচালি, যাত্রার মত জনসংস্কৃতির সমুজ্জ্বল মাধ্যমগুলিকেও কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে একই অভিযোগে। এই সংস্কৃতির দ্রষ্টা এবং উপভোক্তাদের নবজাগৃতির আলোকিত বলয়ে স্থান হয়নি। যেগুলি ছিল নগর কলকাতার প্রাথমিক নাগরিক বিনোদনের উৎস, তাদের ভিটেমাটি কেড়ে নেওয়া হয়েছে এই অজুহাতে। এগুলিকে মর্যাদা দিতে ইতস্তত করেছে শিক্ষিত ভদ্রসমাজ। অথচ এদের সৃজনশীলতা, নান্দনিকতা বা রসবোধ খুব

একটা কম ছিল না। কেবল 'অষ্ট্রীল' বলে দাগিয়ে দিয়ে আসলে এদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

এদেশে সাম্রাজ্যবিস্তারের সুবর্ণসুযোগ হস্তগত হওয়ায় ইংরেজ শাসক তাদের শাসনের সুবিধার্থে এই দেশের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর মগজ ধোলাই করতে চায় নিজেদের শেখানো মন্ত্রে। তাদের সেই মন্ত্রবলেই যা কিছু তাদের অনাকাঞ্জ্মিত, তাকেই ব্রাত্য করে দেওয়া হয়। আর এই কাজটা করে তাদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে গ্রস্ত মোহমুগ্ধ এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়। পাশ্চাত্যের শিক্ষা, পাশ্চাত্যের সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকিত মণ্ডলের বাইরে যে জগতে সারবস্তু কিছু থাকতে পারে, তাই তাদের কাছে অজানা। বিদ্যায়, শিক্ষায়, সহবতে, প্রতিভায় প্রভুশক্তির তুল্য কিছুই নেই। সমালোচক এই শ্রেণির সম্পর্কে চমৎকার বলেছেন :

'ইহাঁদের বিশ্বাস এই, সেকালে লক্ষ্মণ-প্রদত্ত গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া জনক-নন্দিনী সীতা যেমন পঞ্চবটীর পত্র-কুটীরাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিতে নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন,---একালে প্রতিভা-সতীও তেমনি সভ্যতালোক-বিভাসিত পাশ্চাত্য দেশের গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া, আমাদের এই তৃণ-শ্যামল সিকতা-ধূসর বঙ্গভূমে পদার্পণ করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছেন।'

তারা বিশ্বাস-মুপ্ধ, অতএব প্রশ্ন-হীন। আর তাদের মধ্যে কখনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তাকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয় নানাভাবে। সফল হলে ভালো, না হলে তার কণ্ঠরোধ করতে বিন্দুমাত্র ভাবিত হয় না ক্ষমতার সাম্রাজ্যের শীর্ষে থাকা মহারথীরা। তবে মান্য বা শিষ্ট নাগরিক বনাম অপর এর সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক যে দ্বৈরথ এই পর্বে নতুন করে সূচিত হয় তার ফলাফল অন্তিমে যাই হোক না কেন, বিনা যুদ্ধে কোনও পক্ষই প্রতিপক্ষকে সূচ্যগ্র মেদিনী ছাড়েনি। মান্য বা শিষ্ট নাগরিক সাহিত্য-সংস্কৃতি যেমন রুচির দোহাই দিয়ে, অঞ্লীলতার দোহাই দিয়ে, চিত্ত দৃষণের দোহাই দিয়ে তথাকথিত অপরকে আক্রমণ করেছে, জ্ঞান আর আধিপত্যের দ্বারা, পরিকল্পিত সাংস্কৃতিক রাজনীতির দ্বারা তাদের হীন প্রতিপন্ন করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, সেখানে ক্ষমতার বিপরীতে অবস্থান করেও অপর সুবিধা মত প্রত্যাঘাত করেছে প্রতিপক্ষকে। কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে, বিশেষত উপহাসে, পরিহাসে, ব্যঙ্গে, বিদ্রূপে ফালাফালা করেছে উচ্চবর্গের আধিপত্য-বাদী পৃথিবীকে। প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন সমালোচনায় বিদ্ধ করেছে। তাদের বিদেশি ভাষা-প্রীতি, মাতৃভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য, বিজাতীয় আচার-আচরণ, ক্রমবর্ধমান জন-বিচ্ছিন্নতা, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা, উদাসীনতা ইত্যাদি সমস্ত কিছুই হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদ্রূপের লক্ষ্য। তারই পাশাপাশি এই তথাকথিত উচ্চবর্গের যে কোনও সংস্কার-প্রচেষ্টাও এদের মনে সন্দেহ উৎপাদন

করেছে। তবে এই সংঘাতকে প্রগতিশীলতা বনাম রক্ষণশীলতা জাতীয় মোটা-দাগের নামকরণে বেঁধে রাখা অনুচিত। নিজের নিজের শ্রেণি অবস্থান থেকে এই লড়াইটা তারা লড়েছে। এই গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন অভিমুখ থেকে যাচাই করে রচিত সেই ইতিবৃত্তের অন্তিম পর্বে পোঁছে কয়েকটি বিষয় দিনের আলোর মতই স্পষ্ট হয়ে যায়। একথা সত্য যে, এই আধিপত্য-বাদের রাজনীতি শুধুই আধুনিক সময়ের দান নয়। পুরাকাল থেকেই পৃথিবীর ইতিহাসে সুরক্ষিত হয়েছে ক্ষমতাবানের আধিপত্যের সাম্রাজ্য। যার হাতে ক্ষমতা, পরিণামে তারই জয় হয়েছে। ভারতবর্ষের পুরাণ আর ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলেও এর প্রমাণ মিলবে। এই প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমিতে আর্য-অনার্যের, উচ্চ-নিম্নের অজস্র যুগ সঞ্জাত বিরোধ আবহমানকাল ধরে জমি প্রস্তুত করেই রেখেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেই বহু বিভাজিত সমাজের অন্তর্গত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ফায়দা লুটতে দ্বিধা করেনি। সঙ্গত কারণেই নতুন আলোকের ফাঁদ নতুন নাম নিয়ে আরেকবার উনিশ শতকে এই বিচ্ছিন্নতার রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে পদানতের ঐতিহ্যকে আঘাত করেছে, তাকে সুকৌশলে বিনষ্ট করে দিতে চেয়েছে। পূর্বের অধ্যায়গুলিতে ধাপে ধাপে সামগ্রিক বিষয়টি পর্যালোচনা করেছি।

উপনিবেশের আলো-আঁধারি প্রহরে বাঙালি ভদ্রলোকের জীবন ও সাহিত্য যাপনে আভাসিত হয়েছিল স্ববিরোধিতায় ভরা আত্মরূপায়ণের এক কর্মসূচী। ফলে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য একই সঙ্গে বাঙালি ভদ্রলোকদের স্বপ্নের সৃজন এবং স্বপ্নভঙ্গের ইতিবৃত্ত। সময়ের সঙ্গে বঙ্গে হয়তো সেই বৃত্তান্তের নানা অভিমুখ ধরা পড়েছে। কিন্তু নতুন আকাঙ্কা এবং তারই পাশাপাশি তাকে ঘিরে এক অজানা আশঙ্কার যে আবর্ত সেই পর্বকে অস্থির করেছিল, সেই অস্থিরতার ছাপ সেকালের সৃজন-কর্মের গভীরে সৃক্ষাভাবে নিহিত আছে।

উপনিবিষ্ট থাকার কালে উপনিবেশিক শক্তির হাত ধরে সমাজের তথাকথিত প্রগতিশীল অংশ প্রবেশ করে এক নতুন মায়া-বিশ্বে। কিন্তু ক্রমশ সেই মায়ামোহ বিলীন হতে শুরু করলে তারা আবিষ্কার করে সব দিক থেকেই তারা পর-অধিকৃত হয়ে পড়েছে। সেই আত্ম-অবমাননা থেকে সহজে মুক্তি মেলবার নয়। পর-অধিকৃত দেশকে হয়তো বাহুবলে, অস্ত্রবলে মুক্ত করা সম্ভব, কিন্তু পর-কবলিত চৈতন্যের উদ্ধার বড় সহজ কাজ নয়। আর তা যদি না হয়, তাহলে সেই মুক্তিও অসম্পূর্ণ। কিন্তু প্রাথমিক পর্বের এই ভ্রান্তিবিলাসের জন্য সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে পুরোপুরি দোষারোপ করা অনুচিত। উপনিবেশিক শাসনের মঙ্গলময়তার মুখোশ প্রতারিত করেছিল ভদ্রলোক বুদ্ধিজীবীদের। আসলে উনিশ শতকের ভদ্রসমাজ নানা টানাপোড়েনে অস্থির, নানা অসঙ্গতিতে বিভ্রান্ত। এতকাল সীমিত গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে তারা স্বাভাবিকভাবেই, স্বতঃস্কূর্তভাবেই নতুন চেতনার আলোকে আলোকিত হতে চেয়েছিল।

আর যাদের হাত ধরে এই নতুন আলোক-রেখা তমসা ভেদ করে দেখা দিয়েছিল তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার বোধ থাকাটাই স্বাভাবিক। ফলে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের ইংরেজের প্রতি বিশ্বাসের যুগ উনিশ শতকের প্রথমার্ধ। এই বিশ্বাসের জায়গা থেকেই শাসকের প্রতি তাদের প্রশন্তিমালার অন্ত ছিল না। সেকালের সংবাদ বা সাময়িক পত্রগুলির পৃষ্ঠায় এর অজস্র উদাহরণ মিলবে। বিখ্যাত, অখ্যাত বা স্কল্প-খ্যাত যে কোনও পত্রিকাই এমন মহৎ আর উদার রাজশক্তির গুণকীর্তনে খামতি রাখেনি। যেমন 'দুর্জনদমন মহানবমী' নামক এক পত্রিকাতে উল্লিখিত হয়েছিল:

'এরূপ রাজ্যশাসক ভূপতি অতি দুর্লভ পূর্বের্ব এমত রাজা প্রায় ছিল না, সর্বেলোকানুকম্পী, জনহিতার্থে সর্ব্বদাই যত্নবান, কেহ কাহার অনিষ্ট করণে সক্ষম নহেন...প্রবল পরাক্রমী ও সাম দান দণ্ড ভেদাদি নীতিজ্ঞ, দয়ালু, পরোপকারী, এমন ভৈরব শাসন ভূপতি কি আর আছে!'

ব্রিটিশের সভ্যতা-গরিমার ধারণা ইংরেজি-শিক্ষিত ভদ্রলোকদের রীতিমতো আচ্ছন্ন করেছিল। সেই সভ্যতার মূলস্রোতে সামিল হবার জন্য তাঁরা উদগ্রীবও হয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বাস-মুগ্ধতার মধুচন্দ্রিমা-পর্ব অতিক্রান্ত হলে পরিণামে বাঙালী সমাজকে মুখোমুখি হতে হয়েছিল যে ধরনের আত্মমর্যাদাহীন অপমান ও লাঞ্ছনার তা রীতিমত মর্মভেদী। তবে সেই বেদনা এবং বিক্ষোভ তখনই দানা বেঁধে উঠতে না পারার জন্য সেকালের শিক্ষিত বাঙালিকে নিন্দাবাদে জর্জরিত করা অনুচিত। বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ সে সময়ে সচেতন রূপে অচেতন ছিল, প্রকৃত সত্যসন্ধানে অনিচ্ছুক ছিল অথবা সত্যের অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে দিধাগ্রস্ত ছিল, এসব বহিরঙ্গের তথ্যে যতখানি সত্যে, অন্তর্গত সমাজ-দ্বন্দ্বের গূঢ়তর তত্ত্বের প্রয়োগে তা অনেকাংশে ভিন্ন মাত্রিক। তাই তাদের আচরণকে নিক্ষিয়তার অভিযোগে কাঠগড়ায় না তুলে পরিস্থিতির সাপেক্ষে তার বিচার করা উচিত। সুতরাং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তাদের এই মোহগ্রস্ততা যতখানি নিন্দনীয় হয়ে উঠুক, এই সব সত্যির সমান্তর্রালে রয়ে গেছে আরও যে বড় মাপের সত্যি, তা হল সেই মোহ কেটে যাওয়ার ব্রাক্ষমুহূর্তেই বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রগতিশীল অংশ সজাগ হয়ে উঠতে চেয়েছে আত্মপরিচয়ের সন্ধানে এবং আত্ম-ঘোষণার উপযুক্ত ভাষার আবিষ্কারে।

আসলে ঔপনিবেশিক শক্তির দখলদারি মানসিকতার সূত্রে উপনিবেশের মানুষ অনেককিছু হারিয়েছে। তাদের রীতি-নীতি, আচার-বিচার, ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি সমস্ত কিছুই প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়েছে। উড়ে-এসে জুড়ে বসে ঔপনিবেশিক প্রভুরা উচ্ছেদ করে দিয়েছে উপনিবিষ্টের এতকালের জীবনযাপনের সমস্ত শর্তগুলিকে। মুখে প্রচার করেছে তাদের সাধু-সংকল্পের কথা। অনুন্নতদের সভ্য এবং উন্নত করে তোলার মহান

ব্রতের কথা। এদিকে বিনিময়ে দখল করেছে তথাকথিত অনুন্নতদের সমস্ত সম্পদ। চেয়েছে তাদের প্রশ্নহীন আনুগত্য। উপনিবিষ্টের মনে খোদাই করে দিতে চেয়েছে এই বীজমন্ত্র যে, শাসকের ছত্রছায়ায় পালিত হলে তবেই মিলবে উন্নততর জগতে প্রবেশের চাবিকাঠি। হতে হবে শাসকের ছায়ার মত অনুগত এবং বিশ্বস্ত। নিজেদের সন্তা, স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে হয়ে উঠতে হবে কলের পুতুল। উনিশ শতকীয় একজন ঔপনিবেশিক ভারতীয়ের সামনে পথ তখন এটাই। মেনে নেওয়া, মেনে না নেওয়ার দন্দে সে অস্থির। তখনও তীব্র আন্দোলন-প্রতিরোধ করে ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের ধারণা তৈরি হয়নি বুদ্ধিজীবীর। বশংবদ হওয়াই তখন তার নিয়তি। সমালোচক যথার্থই বলেছেন:

'....'মানুষ' হতে হবে, আর 'মানুষ' হওয়া মানে শোষকদের ছায়া হতে হবে---ক্রমে এই হয় তখন তাদের ধ্যানজ্ঞান। সেদুর্বিপাকে শাসিতের চৈতন্য পরিলিপ্ত হয় শাসকের আদর্শে;
তাদের হৃদয়, মনন, অস্তিত্ব জুড়ে বিরাজ করে শোষকেরই
মূর্তি। এতে শাসক-সত্তা থেকে নিজেদের বিশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র করে,
দেখবার ক্ষমতাও তারা যেমন অনেকখানি হারিয়ে বসে, তেমনি
নিজেদেরও জরিপ করতে শুরু করে শাস্তার চোখে।'

আসলে নাম আর পরিচয় ভুলিয়ে দেওয়াই ঔপনিবেশিক শক্তির সবচেয়ে বড় অস্ত্র, সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্রও বটে। জ্ঞানও তাদের কাছে নিপীড়ন করার অস্ত্র। ক্ষমতাশালীর স্বার্থের পোষকতা করার জন্যই জ্ঞান ব্যবহৃত হয় সেখানে।

আসলে উনিশ শতকের মূল সংকট ঔপনিবেশিক মেধাজীবীর মননের সংকট। তাঁদের সংস্কৃতির এক দীর্ঘ পরম্পরা আছে, ঐতিহ্য আছে, একথা তাঁদের একেবারে অজানা এমন নয়। স্বাভাবিকভাবেই তা শাসকশক্তির সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের থেকে পৃথক। কিন্তু শুধু শাসকের রুচির কাছে মান্যতা পাবে না ভেবে অদ্ভুত হীনমন্যতায় তার প্রতি অবহেলা করেন। তাঁরা প্রত্যেকে একটি ব্যাধিতে আক্রান্ত। যাকে বলা যেতে পারে কলোনিয়াল সিনড্রোম। সেকারণে প্রতিনিয়ত তাঁরা তীব্র দ্বিচারিতায় ভোগেন। নিজেদের সমস্ত কিছু তুচ্ছ আর ম্লান মনে হয়, পশ্চাৎপদ মনে হয়, বিপরীতে সগৌরবে নিজের বিজয়পতাকা তুলে ধরা পাশ্চাত্য সভ্যতা আর সংস্কৃতিকেই মনে হয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা। সমালোচক ব্যাখ্যা করেছেন:

'ঔপনিবেশিক হওয়ার পর ধীরে-ধীরে উপনিবেশের মানুষের একধরনের সমবেত স্মৃতিক্ষরণ ঘটে। কে-কারা দায়ী একটি স্বায়ত্তশাসনাধীন দেশের ঔপনিবেশিক হয়ে ওঠার জন্য, ধূসর হয়ে যায় দোষারোপের পরিসরও।' এই ধূসরতার পরিসরেই ক্রমশ অনুভূত হতে থাকে যে হারিয়ে যাচ্ছে নিজেদের সমস্ত সম্পদ, আত্মিক এবং মানসিক দিক থেকেও চেতনাকে গ্রাস করছে নিঃসীম শূন্যতা। প্রকট হতে থাকে স্বাধীনতা হারানোর বেদনা। প্রকৃত অর্থে উনিশ শতকের শেষ পর্বে পৌঁছে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল পরাধীনতার গ্লানি। তার আগে অবধি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দীর্ঘ শাসনের অবসানে মহারানির হাতে রাজদণ্ড চলে যাওয়াকে শিক্ষিত সমাজ আনন্দ-সংবাদ হিসেবেই বিবেচনা করেছিল। মহারানির আশ্বাস-বাক্যে প্রজা হিসেবে সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার পাওয়ার আকাজ্ফায় বুক বেঁধেছিল তারা। তাদের ধারণা ছিল রাজানুগ্রহ (এক্ষেত্রে রানি ভিক্টোরিয়ার অনুগ্রহ) পেলে আর কোথাও কোনও অসাম্য থাকবে না। সম্রাজ্ঞী ভার নিলে যে ভারতের দুঃখ ঘুচবে সে বিষয়ে অনেকেই সহমত ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ) 'নীলকর' কবিতাতেও এমন কথা উল্লিখিত হয়েছে। এমনকি ইংরেজদের অত্যাচার যে দিনে দিনে মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে সে বিষয়েও এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা ধারণা বাসা বেঁধেছিল। তা হল 'ভাল ইংরেজ' আর 'খারাপ ইংরেজ' এর তত্ত্ব। খারাপ ইংরেজরাই অব্রিটিশোচিত আচরণ করে থাকে, কিন্তু ভালো ইংরেজরা মহানুভব। তাদের সহায়তা পেলে এসব অত্যাচার বা পীড়ন বন্ধ হতে সময় লাগবে না। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' (১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ) জাতীয় নাটকগুলির কথা এখানে বলা যেতে পারে। যেখানে একদিকে 'ইংরাজ জাতির কলক্ষ' খারাপ সাহেব আর অন্যদিকে 'ভাল সাহেব'কে তুলে ধরা হয়েছিল এবং অকুণ্ঠভাবে ব্রিটানিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া এই দেশের শাসনভার নিলেও মৌলিক পরিবর্তন যে তেমন কিছুই ঘটবে না, নাম বদলাবে---শাসনের স্বরূপ বদলাবে না, এটা বুঝতে দেরি হয়েছিল অনেক। এর ফলে স্বর্গসুখ লাভ হয়নি তাদের। বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দমন-পীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি হয়েছিল। শাসনব্যবস্থার চূড়ান্ত ক্ষমতা শ্বেতাঙ্গদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল, দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হত তাদের সুবিধা অনুযায়ী, প্রশাসনের সমস্ত উচ্চপদগুলি ছিল তাদের জন্যই সংরক্ষিত, দেশের আইন-কানুন পর্যন্ত তাদের স্বার্থরক্ষায় তৎপর ছিল। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ), আর্মস অ্যাক্ট (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) ইলবার্ট বিলের (১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ) মত ঘটনা তো দেশীয় মানুষের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ সমাজের স্বার্থ-জনিত সংহতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। নানা প্রকারের পক্ষপাতমূলক আচরণ ছিল প্রতিদিনের ঘটনা। অগণিত ভারতবাসী যে মূলত বিদেশি শাসকের গোলামে পরিণত হয়েছে, তাদের স্বপক্ষে কথা বলার স্বাধীনতাটুকু নেই একথা স্বীকার করে 'কুমারী' নামক একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এই আক্ষেপ-বার্তা :

'When we were strong and independent none durst say a high word to us, but now that we

have lost our independence, we are being trampled upon and tyrannised over by foreigners and have not the liberty of speaking even just a word in our defence. With independence are gone prosperity and happiness. What is then left to us? We have become accustomed to oppreaaion, ill treatment and injustice. What is there to comfort us? We have lost everything. Why is then life left to us? O God you have ruined India!"

স্বপ্নাতুর চোখে যে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে মনে হয়েছিল নতুন ঊষার স্বর্ণদার, চিত্তবিকাশের সহায়ক শক্তি, জ্ঞানমার্গের আলোকবর্তিকা, তা অচিরেই নিজের স্বরূপ প্রকাশ করল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য অনুসারে বললে :

'ক্রমে ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে।'^{১১}

সে আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায় সবকিছু। মানুষকে শোষণ এবং পেষণ করাই তার এক এবং অদিতীয় লক্ষ্য। উপনিবেশবাদের মনভোলানো অনুদানকে যাচাই করে নেবার সময় এলে দেখা গেল সভ্যতার নামে আগ্রাসনের কুৎসিত বিস্তারের স্বরূপ। সে নিজের লোলুপ থাবায় শাণ দিয়ে কেবল সমস্ত অধিকার করতে চায়, দখল করতে চায়, ভোগ করতে চায়। তার এই সর্বগ্রাসী চাহিদা ঘনিয়ে তোলে সংকটের কালো মেঘ। সিভিলাইজেশনের এই কুশ্রী চেহারা দেখে পীড়িত রবীন্দ্রনাথ নিজের কলমে তুলে ধরেছিলেন ব্যথিত অনুভূতির অক্ষরমালা :

'সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিনু জানি তা-আজ দেখি কী অশুচি, কী যে অপমানিতা। কলবল সম্বল সিভিলাইজেশনের, তার সবচেয়ে বড় কাজ মানুষকে পেষণের।'^{১২}

ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার আদিতেই বিরাজ করে সাম্রাজ্যবাদের বীজ। সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীব্যাপী সম্প্রসারণ চায়। সাম্রাজ্য-লোভী শাসকের একমাত্র লক্ষ্যই শাসন-বিস্তার এবং যেন-তেন-প্রকারেণ তাকে অক্ষত রাখা। এখানেও তার অন্যথা হয়নি। ভূখণ্ড এবং মন বিভাজনের নীতিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তারা নিজেদের সুবিশাল সাম্রাজ্য সুরক্ষিত রাখতে চেয়েছে। শুধু অস্ত্রবলে হয়তো ক্ষমতা দখল করা যায়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে অধিকার কায়েম করতে গেলে, রাজ করতে গেলে শাসিতের চৈতন্যের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন সবচেয়ে জরুরি। সেটাই তার সবচেয়ে জোরের জায়গা হয়ে দাঁড়ায়। শাসিত যদি স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেয় শাসকের উৎকর্ষকে, তাহলে কাজ হয়ে যায় অনেক বেশি সহজ। বাঙালি বুদ্ধিজীবীর চোখে ব্রিটিশ শাসন প্রসঙ্গে উল্লিখিত অধ্যাপিকা অনুরাধা রায়ের কথাটা যথার্থ মনে হয় যে আসলে উপনিবেশিকতা হল একটা মানসিক প্রক্রিয়া, যেখানে শাসক ও শাসিত উভয়েই অংশগ্রহণ করে। এখানেও উন্নততর সভ্যতা এবং সংস্কৃতির দাবি প্রতিষ্ঠা করে, মানসিকভাবে উপনিবিষ্টকে অবশ করে দিয়েই তারা রাজত্ব বজায় রেখেছে। আর আখের গোছানোর এই সুপরিকল্পিত চক্রান্তে আন্তে আন্তে খসে পড়েছে সভ্যতার মুখোশ। তাই একসময় যে সভ্যতাকে মনে হয়েছিল মুক্তির সোপান, বেদনার সমুদ্র মন্থন করে জানা গেছে তারই কৃপণতা আর দীনতায় উপনিবেশের প্রজাদের মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে আরও একবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে:

'এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে, তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।''

সময় দিয়ে গেছে সবচেয়ে জরুরি শিক্ষা যে, পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে গেলে কেবল বহিরঙ্গে ক্ষমতার হস্তান্তরই শেষ কথা নয়, ভূখণ্ডের পরাধীনতার শিকল কাটাতেই দায়িত্ব শেষ নয়। অন্তরে যে পরাধীনতার শিকল পরানো আছে, তাকে মোচন করা একান্ত প্রয়োজন। আসলে প্রয়োজন সার্বিক বি-উপনিবেশীকরণের। উপনিবেশিক প্রভুর কাছে বন্ধক দেওয়া মনকে ছাড়িয়ে নিতে হবে। অত্যাচারে, অনাদরে, অবহেলায় হারিয়ে যাওয়া নিজের বিস্মৃত ইতিহাসকে অতীত খুঁড়ে উদ্ধার করতে হবে। বারংবার আঘাতে আড়ন্ট হয়ে যাওয়া নিজের ভাষা-সভ্যতা-সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। আর তা করতে হবে পাশ্চাত্যে নির্মিত আধুনিকতার ধারণাকে মাথায় না রেখে। কারণ সেখানে আধুনিক বলতে বোঝায় শুধু পশ্চিমি মূল্যবোধগুলিই। আর তার হাত ধরেই রচিত হতে থাকে একের পর এক উপনিবেশিক শূন্যতার কাহিনি, কাল অতিক্রম করেও যা মানুষের মনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে প্রস্তত। নিজস্ব কণ্ঠস্বর ফিরে পেতে গেলে এই

পশ্চিমি মূল্যবোধকে সার্বিকভাবে প্রত্যাখ্যান করতেই হবে। অভ্যাসের খাঁচা ভেঙে ফেলে নতুন পথ-সন্ধান করতে হবে।

সময়ের প্রত্যাঘাত সময়েরই হাতে। উনিশ শতক জুড়ে তাই মান্য বা শিষ্ট নাগরিক বনাম অপরের মধ্যে সমাজে সাহিত্যে সংস্কৃতিতে যে দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে উঠেছে তা উত্তরকালে নিয়ে এসেছে নতুন মাত্রা। মান্য নাগরিক সাহিত্যকে মূলধারায় প্রতিষ্ঠা দেওয়ার পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্য নিয়ে দেশজ সাহিত্যকে অপরত্বের অভিধা দিয়ে নিন্দিত এবং বিপন্ন করা হয়েছে ঠিকই, তবে অনেক চেষ্টা করেও দেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে একেবারে মেরে ফেলা সম্ভব হয়নি। ঔপনিবেশিক শাসন এবং এদেশীয় ভদ্রলোকদের যাবতীয় প্রয়াস সত্ত্বেও সে নিঃশেষিত হয়নি। শ্রীলঙ্কার অধিবাসী, প্রাচ্যের প্রখ্যাত চারুকলা-বিশেষজ্ঞ আনন্দ কুমারস্বামীর (১৮৭৭-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) 'The Nature of Folklore and Popular Art' রচনা থেকে পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যেতে পারে তথাকথিত সংস্কৃতির High way ধরে না হলেও By-way দিয়ে তার চর্চা চলেছে। উনিশ শতকের কালিক পরিসরে হয়তো তারা বৈষম্যের শিকার হয়েছে, সাময়িকভাবে চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু এই জনপ্রিয় সাহিত্য-সংস্কৃতির শাখাগুলির প্রতি পরবর্তীকালে মুক্তমনা মানুষের আগ্রহ জন্মেছে। আত্মবিস্মৃতি আর আত্ম-ধ্বংসের রূপকে মোড়া দেশকালে ক্রমে প্রবল হয়েছে ফিরে দেখার তাগিদ, শিকড়ের টান। পরবর্তীকালে একথার সমর্থনে বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' প্রবন্ধে যে কথা বলেছিলেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি শিক্ষিত বাঙালি আর খাঁটি বাঙালির বিভাজনের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন আজকের কবিদের ভাববার বিষয় হয়েছে জনমনের চৈতন্যের সঙ্গে, দেশের সংস্কৃতির কেমনভাবে মেলবন্ধন ঘটানো যায়। বুঝেছিলেন আমাদের কাব্যও আজ শিক্ষিত শ্রেণির বিড়ম্বিত কাব্য-সাধনার চূড়ান্ত পর্যায়। সমাজজীবনে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের অভাব লক্ষ্য-গোচর। দেশীয় ঐতিহ্যের অনুসন্ধান একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। আজকে তাই কবিকুলকে ভাবতে হচ্ছে বাংলার জনসমাজের চৈতন্যের সঙ্গে দেশজ সংস্কৃতির সেতুবন্ধনের কথা। কেবল কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিটি শাখার ক্ষেত্রেই এই সংযোগ স্থাপনের কথাটি প্রযোজ্য। এই সেতুবন্ধনের সূত্র ধরেই ভিক্টোরিয়ান নীতি আর শুচিতার তরঙ্গ থিতিয়ে যাওয়ার পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানুষের নিরন্তর অনুসন্ধিৎসায় আবার উঠে আসছে এককালের অবহেলিত, অবজ্ঞাত, ধূলিধূসর অতীত, তার বিগত রঙ, রস, গন্ধ নিয়ে। তথাকথিত মননশীল সাহিত্যচর্চার উচ্চাসন থেকে নেমে নতুন করে খুঁজে আনা হচ্ছে অপর সাহিত্যের নানা নিদর্শন, শোনার চেষ্টা হচ্ছে 'অপর' এর অশ্রুত কণ্ঠস্বর।

দিন-বদলের সঙ্গে সঙ্গে যুগ-রুচির পরিবর্তন ঘটেছে। বদল হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গির। বদলে গেছে শ্লীলতা-অশ্লীলতার ধারণা। ভিক্টোরীয় যুগে তাকে কেন্দ্র করে যে শ্বাসরোধী উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল, তা কালের নিয়মে অপসারিত হয়েছে। উনিশ শতকে বাঙালি হিন্দুর জাতিসত্তা গঠন পর্বে ভদ্র বাঙালির যে নীতিবাগীশ মানসিকতা প্রকট হয়ে উঠেছিল, তা পরিবর্তিত হয়েছে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ঔপনিবেশিক শাসকেরা বিদায় নিয়েছে। ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক বিধিনিষেধ ক্রমে শিথিল হয়ে গেছে সময়ের হাত ধরেই। ঔপনিবেশিক শিক্ষা-প্রসূত সাহিত্য-সংস্কৃতির ছত্রছায়ায় অশালীনতা, চিত্ত-দূষণের যে কারণগুলি খোদাই করে দেওয়া হয়েছিল মানুষের মনে, তাতে ফাটল ধরতে শুরু করেছে। ঔপনিবেশিক মূল্যবোধগুলি প্রশ্নের মুখে পড়েছে। অপরিমিত শুচিবায়ুগ্রস্ততার প্রভাব ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ইংরেজ-আরোপিত নৈতিক মানদণ্ড আর চিত্ত-লোককে অধিগত করে রাখতে পারেনি। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ জেগেছে। অনুভূত হয়েছে নিজেদের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় ঘোষণা করার প্রয়োজনীয়তার কথাও। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কাছে পরাভব স্বীকার না করে নিজেদের স্বয়ংক্রিয়তা ঘোষণা করার দিন এসেছে। আর এসব করতে গিয়েই হারানো সময়কে ফিরে দেখা হয়ে উঠেছে এক বিকল্পহীন দায়বদ্ধতা। সামনের গন্তব্য যত বিস্তৃত হয়েছে, নিজেদের অতীত, নিজেদের শিকড়, নিজেদের সাহিত্য, নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি অনুসন্ধিৎসা তত বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে বঞ্চনা, উপেক্ষা, অবহেলায় যেগুলি লুপ্তপ্রায়, তাদের নতুন করে সংরক্ষণের এই তাগিদ প্রমাণ করে দেয় যে গোঁড়ামি কাটতে শুরু করেছে। যার আদিরূপ যেমন, তাকে সেভাবেই গ্রহণ করার মানসিকতা বুঝিয়ে দিচ্ছে সাহিত্য-সংস্কৃতিকে কেবল ব্যক্তিগত রুচির মাপকাঠিতে বিচার করার গোলকধাঁধা থেকে মুক্ত হতে শুরু করেছে আধুনিক মানুষের মন। মনে করা হচ্ছে মৃত্তিকালগ্ন উৎস, উপকরণ বা অভিব্যক্তি দিয়ে গড়ে উঠেছে যে সাংস্কৃতিক অবয়ব, তার পাঠ করতে গিয়ে গ্রহীতা নিজের অর্জিত দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মাণ করে নেবেন নিজস্ব প্রতিবেদন। অন্যের শেখানো পথে সভ্য হবার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হলে সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ সন্ধান করতে চেয়েছে মানব-মন। আর তখন অনুভূত হয়েছে নিজেদের মূঢ়তায়, অজ্ঞতায়, অনভিজ্ঞতায়, নিজেদের আত্মঘাতী প্রবণতায় একটা যুগের একমাত্রিক ছবি আঁকা হয়েছে। অন্ধকারে থেকে গেছে আরেকটা দিক, যাকে বাদ দিয়ে প্রকৃত অর্থে একটা যুগকে, তার স্বরূপকে যথার্থভাবে চিহ্নিত করা যায় না। রচনা করা যায়না তার প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস। আর এই তথাকথিত অপরত্বের অভিধায় নিন্দিত সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমগুলি সেই সময়ের দলিল। এই দলিল আমাদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার পুনঃপাঠের সর্বাধিক কার্যকরী উপাদান।

উপনিবেশের কাল অতিক্রান্ত হবার পর আমরা উত্তর-ঔপনিবেশিক বিশ্বে প্রবেশ করেছি। উনিশ থেকে একুশ শতক---অতিক্রান্ত হয়ে গেছে শতাব্দীকালের সময়সীমা। মনে রাখতে হবে, উপনিবেশীকৃত অসহায় মন কখনও আধিপত্যবাদকে, তার নির্মিত বাচনকে প্রশ্ন করতে পারে না। জ্ঞান আর প্রতাপের রাজনীতি তাই টিকে থাকে পরাজিত উপনিবিষ্টের এই বিকল্পহীনতার ওপর ভর করে। তাই বর্তমানে আধিপত্যবাদের মৌরসিপাট্টা ভেঙে বিকল্প চেতনার আবাহন হয়ে উঠেছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তর-আধুনিক কালখণ্ডে দাঁড়িয়ে বিকল্প এই চেতনার হাত ধরে আছে শিকড়ের সন্ধানে যাত্রা। উপনিবেশের আগ্রাসনে নিঃসাড় হয়ে যাওয়া মনের মাটিতে জেগে উঠছে নতুন চেতনার অঙ্কুর। যেসব কণ্ঠকে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল, তারা ফিরে পাচ্ছে তাদের ভাষা। স্বীকৃত হচ্ছে তাদের উপস্থিতি। উপনিবেশোত্তর পরিসরে নব্য অর্জিত মূল্যবোধের নানা রূপরেখা দেখা যাচ্ছে। সত্যকে বিমূর্তায়িত করার আধিপত্যবাদী কৌশলকে রোধ করে, ঔপনিবেশিক নির্মিতিকে উপেক্ষা করে, প্রত্যাখ্যান করে একালের স্রষ্টারা প্রান্তিকায়িত সত্তাকে পুনরাবিষ্কার করছেন। নির্মাণ করে তুলছেন আখ্যান বয়নের নতুন সূত্র।

সাম্প্রতিক কালে সময়ের দাবিতেই শিষ্ট এবং অপর সাহিত্যের সেই কঠিন ভেদ রেখা অনেকটা কমে এসেছে। বিশেষত সাহিত্যের বিষয় নির্বাচন এবং ভাষা ব্যবহার দৃটি ক্ষেত্রেই লেখক এবং পাঠকের 'পিউরিটান' মনোভাবে পরিবর্তন এসেছে। এই 'পিউরিটান' মনোভাব ছিল ঔপনিবেশিক সভ্যতার দান। উনিশ শতকের সেই অশান্ত প্রহরে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে নীতিবাগীশদের শুচিবায়ু ছিল, তা এখন অবসিত-প্রায়। ভাষা ব্যবহারে, বিশেষত শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষের ছুৎমার্গ অনেক কমেছে। ভিক্টোরীয় যুগের রক্ষণশীল মানসিকতায় যে শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই কানে আঙুল দেওয়ার মত পরিস্থিতি তৈরি হত, সেসব শব্দ এখন অবলীলায় উচ্চারিত বা লিখিত হয়। এই কারণে এখন সাহিত্যের জাতিচ্যুতি ঘটে না। ইতিমধ্যে মানুষের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। বিশ্বায়ন, মুক্ত অর্থনীতি, খোলা বাজার, যন্ত্র সভ্যতার বিপুল বাড়বাড়ন্ত পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। সমাজ-কাঠামো আর জীবন্যাপনের এই রূপান্তর পাঠ-রুচির পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। এখন পাঠক তুলনায় সহজে তার নিজের পাঠাকাঙ্ক্ষা অনুসারে নিজে নির্বাচিত করে নিতে পারে সে কোনটা পড়বে, কোনটা পড়বে না। জোর করে নীতির দোহাই দিয়ে তাকে নিবৃত্ত করা চলে না। তবে একথা ভাবার কারণ নেই যে এর ফলে সাহিত্যের মানের সঙ্গে আপোষ করে চলতে হবে। বিষয়ের গভীরতা এবং আঙ্গিকের উৎকর্ষই বরাবরের মত তার মান স্থির করে দেবে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে কেবল মহৎ সাহিত্যই কালজয়ী হতে পারবে। যার মধ্যে সেই উৎকর্ষ নেই, তা কালেই নিয়মেই বিলীন হয়ে যাবে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যার শিকড় প্রাণের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন তা একসময় অবলুপ্ত হবে, যা শিকড়ে জলের সন্ধান পাবে, তা-ই রক্ষিত হবে।

উনিশ শতকের কলকাতায় শিষ্ট নাগরিক বনাম অপর সাহিত্যের দ্বান্দ্বিকতার সমীকরণ খুঁজতে গিয়ে সমাজ-দর্পণে এমনই সব বাস্তব সমাজসত্যের সন্ধান মেলে। এই সমাজসত্য শুধুমাত্র খণ্ডকালের পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়, এই সময়ের প্রান্তে দাঁড়িয়ে পুনর্বিশ্লেষিত। উনিশের সীমা অতিক্রম করে আজও তা প্রাসঙ্গিক। এই গবেষণার প্রস্তাব ছিল উভয় সাহিত্য এবং সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্বময় সম্পর্কটিকে যথাযথ অবয়ব দেওয়ার চেষ্টা করা। গবেষণার অন্তিম পর্বে সেই দ্বন্দের ফলশ্রুতি অভিব্যক্ত হল। এই অবয়বদানের নিরন্তর প্রয়াসে সাহিত্যের সঙ্গে মিলে গেছে কখনো ইতিহাস, কখনো সমাজতত্ত্বের নানা সূত্র। এই মিশ্রণ অমোঘ এবং অনিবার্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতাবাদীদের হয়তো এই মিশ্রণে আপত্তি থাকতে পারে, সাহিত্যের শুদ্ধতার হানি হয়েছে এমন অভিযোগও উঠতে পারে। আসলে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চায় যে রক্ষণশীলতার বিষবৃক্ষটি মহীরুহের আকার ধারণ করেছে তাকে সমূলে উৎপাটন করতে না পারলে অন্তর্বিদ্যামূলক গবেষণা কেবল একটি পরিভাষা হয়েই থেকে যাবে, তার প্রয়োগ হবে না। বিনীত সাহসে এই গবেষণাটি সেই পথের পথিক হল। এরপর তার জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে সময়ের হাতে, কারণ জীবনদর্শনের প্রাক্ততায় সময়ই সবকিছর শ্রেষ্ঠ এবং যথার্থ বিচারক।

উল্লেখপঞ্জি

- ১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড,* ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২২, পৃ ৫২৮
- Random House India in 2011, Prologue
- o. Sarkar, Susobhan, On the Bengal Renaissance, Papyrus, Calcutta 1979, p 71
- 8. বসু, স্বপন, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, অগাস্ট ২০১৬, পৃ ২০৭
- ৫. ভট্টাচার্য, তপোধীর, প্র*তীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব,* অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ ১৩০
- ৬. মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন (সম্পাদিত), *দাশরথি রায়ের পাঁচালী,* কলিকাতা, ভবানীচরণ দত্তের খ্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম মেসিন প্রেস হইতে শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, সন ১৩০৯, পৃ ২
- ৭. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পৃ ২৮৮
- ৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য,* কারিগর, কলকাতা, ২০০৩, পৃ ২৭৪

উপসংহার

- ৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়ম, রে প্রমত মন মম, দেশ, ২ জুলাই ২০১৮, পৃ ৩৪
- ১০. বসু, স্থপন, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস,* পৃ ৩৮৯
- ১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কালান্তর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪১৭, পৃ ২১
- ১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ধ্বংস, গল্পস্বল্প, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড,* ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২, পৃ ৫০৮
- ১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সভ্যতার সংকট, কালান্তর, পৃ ৪১৪